প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পুনমুর্দ্রণ ঃ জানুয়ারি, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা (ষষ্ঠ পত্র) **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 6 : 22

		রচনা	সম্পাদনা
একক 81–83	❑	অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 6 : 23 (ক)

		রচনা	সম্পাদনা
একক 84–87	❑	অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী	অধ্যাপক পুলিন দাশ

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 6 : 23 (খ)

		রচনা	সম্পাদনা
একক 88–90	❑	অধ্যাপক নীহারকান্তি মণ্ডল	অধ্যাপক দিলীপ কুমার নন্দী

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 6 : 24

		রচনা	সম্পাদনা
একক 91 & 92	❑	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক	অধ্যাপক জীবেন্দুকুমার রায়

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 6 : 25

		রচনা	সম্পাদনা
একক 93–96	❑	শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার	অধ্যাপক পুলিন দাশ

পরিমার্জন, প্রুফ-সংশোধন ও পুনঃসম্পাদনা ঃ

ড. অনামিকা দাস, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস

ড. মননকুমার মণ্ডল, এসোসিয়েট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG — 6

(বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম)

পর্যায়
22

একক 81	❑ নাটক	7–19
একক 82	❑ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর নীলদর্পণ	20–96
একক 83	❑ নীলদর্পণ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ	97–122

পর্যায়
23 (ক)

একক 84	❑ নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথ	125–134
একক 85	❑ রূপক-সাংকেতিক নাটক ঃ রথের রশি	135–191
একক 86	❑ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য	192–292
একক 87	❑ নবান্ন নাটকের আলোচনা	293–369

পর্যায়

23 (খ) নাটক ও মঞ্চ

একক 88 ❑ নাট্যমঞ্চ ঃ দেশি ও বিদেশি 370–389

একক 89 ❑ মঞ্চাভিনয় ঃ বাংলা নাটক 390–411

একক 90 ❑ বাংলা নাট্যাভিনয়ের নবযুগ 412–422

পর্যায়

24

একক 91 ❑ কাব্য ঃ গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য 425–451

একক 92 ❑ নাটক ঃ সাহিত্যের রূপভেদ 452–482

পর্যায়

25

একক 93 ❑ প্রবন্ধ ঃ গুরু প্রবন্ধ ও লঘু প্রবন্ধ 485–495

একক 94 ❑ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস 496–514

একক 95 ❑ আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস 515–526

একক 96 ❑ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প 527–540

একক ৮১ ❐ নাটক

গঠন

৮১.১ উদ্দেশ্য

৮১.২ প্রস্তাবনা

৮১.৩ নাটক ঃ সংজ্ঞা ও লক্ষণ বিচার

৮১.৪ সারাংশ

৮১.৫ অনুশীলনী—১

৮১.৬ নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

৮১.৭ বাংলা নাটকের আদিযুগ ঃ নাট্যগীত, যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা

৮১.৮ আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ ঃ রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু

৮১.৯ সারাংশ

৮১.১০ অনুশীলনী—২

৮১.১১ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১.২)

৮১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৮১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি নাটক, নাটকের সংজ্ঞা, লক্ষণ, নাটকের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। নাটক পাঠ ও আলোচনায় এটি অপরিহার্য শুধু নয়, নাট্যরস আস্বাদনে এই এককটির গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এই এককটিকে পাঠ্য তিনটি নাটক পড়ার ভূমিকারূপে গণ্য করা যেতে পারে।

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানতে পারবেন।
- সাধারণভাবে নাটকের এবং বাংলা নাটকের উদ্ভব ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করবেন।
- বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে অর্জিত প্রাথমিক জ্ঞান থেকে পাঠ্য তিনটি নাটক পড়া সহজ হবে।
- পাঠ্য তিনটি নাটক পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি যে কোন বাংলা নাটক পড়ে বুঝতে এবং নিজে নিজে আলোচনা করতে পারবেন।

৮১.২ প্রস্তাবনা

নাটক জীবনের দর্পণ। জীবনকে প্রত্যক্ষত দেখতে, জানতে, বুঝতে নাটকের বিকল্প নেই। দেশ-কাল-সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত জীবন নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাটক মিশ্রকলা—একাধারে যেমন পাঠ্য আবার অভিনয়েও বটে। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রী ভরত-এর মতে, নাটক হল সর্ব শাস্ত্র, শিল্প, কর্ম ও বিদ্যার সমন্বয়ে রচিত। নাটক জীবন নিয়ে রচিত। তাই সমাজের জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের শিল্পীত রূপ নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহচর্যে, তাঁর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও অনুভব নাটকে রূপায়িত করে পাঠকের মনোরঞ্জন করেন। নাটকের এটিই অন্বিষ্ট। এই অন্বেষা থেকে নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহায্যে কল্পনায় অনুভূত জীবন অভিজ্ঞতার একটি বাস্তবসম্মত রূপ প্রদান করেন নাটকে। যেখানে দর্শক-পাঠক দেখতে পান মানব প্রবৃত্তির নানা সংঘাত, প্রতিকূল প্রতিবেশ দৃশ্য অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা নিয়ত রহস্যময় একটি চলমান জীবন। এই জীবনকে তুলে ধরতে নাট্যকার তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন। চরিত্রগুলি তাদের আঙ্গিক-বাচিকাদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন। নাটক তখন দেখা, শোনা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শ্রাব্য, দৃশ্য ও কাব্য হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের গভীরতর রসচৈতন্যের সঙ্গে এভাবে যোগ সৃষ্টি হয় নাটকের। তাই নাটকের জন-সমাদর যুগ থেকে যুগাতীত ব্যাপ্ত।

বর্তমান এককে আপনারা নাটককে জানবেন স্বরূপে, তার তত্ত্বে, ইতিহাসে, শিল্পকর্মে ও প্রয়োগে। আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যখন নাটক শ্রাব্য-দৃশ্য ও কাব্য হয়ে ওঠে, জনপ্রিয়তা পায়, তা থেকেই নাট্যসাহিত্যের চাহিদা তৈরী হয়। বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা প্রধানত এই চাহিদা থেকেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশকালের সামাজিক রাজনৈতিক অন্তঃপ্রেরণা। নাটক ক্রমশ হয়ে উঠল মনোরঞ্জন থেকে মননের বিষয়। নাটক ও মঞ্চ এভাবে মধ্য উনিশ শতক থেকে একুশ শতকে পদার্পণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। উদ্ভব লগ্নের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বাংলা নাটক যথার্থ অর্থে পদার্পণ করল মধুসূদন দত্তের সীমিত কয়েকটি নাট্যপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে। আর তারই সমকালে দেশকালের প্রেক্ষাপটে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। এই নাটকটি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কয়েকটি 'দর্পণ' নাটকের প্রেরণা জুগিয়েছে। কলকাতার সখের নাট্যদল ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (১৮৭২) এই নাটকটির অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর নাট্যাভিনয় আর শৌখিন নাট্যদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। কলকাতায় একাধিক পেশাদারী মঞ্চ ও মঞ্চাভিনেতার আবির্ভাব ঘটল। এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি একাধারে ছিলেন অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, পরিচালক ও নাট্যকার। মঞ্চের প্রয়োজনে নাটক লেখার আগ্রহও দেখা গেল। অনেক শক্তিশালী নাট্যকারের এ সময় আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন—অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যপ্রয়াসের ব্যতিক্রম নন। তিনি নানা রসের ও আঙ্গিকের নাটক রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রূপক-সাংকেতিক নাটকের তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘরের' মত 'রথের রশি' রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ভুক্ত।

পরপর দুটি মহাযুদ্ধ বিশ্বসমাজ—রাজনীতিতে নানা আলোড়ন ও রূপান্তর ঘটিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা জনমানসের প্রগতি চেতনায় নতুন মাত্রা যুগিয়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ নিদেনপক্ষে দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার সহমর্মী হতে এবং তা অপনোদনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

মঞ্চে গড়ে উঠেছে প্রগতি নাট্য আন্দোলন—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এদের প্রথম বাংলা নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন'। পরবর্তীকালে গণনাট্য আন্দোলন ক্রমশ নবনাট্য সৎনাট্য আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। 'নীলদর্পণ', 'রথের রশি' ও 'নবান্ন'—এই তিনটি নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিকাশ ও তার সাম্প্রতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে আপনি বর্তমান পত্রে অবহিত হতে পারবেন।

৮১.৩ নাটক ঃ সংজ্ঞা ও লক্ষণ বিচার

সাহিত্যের স্বতন্ত্র একটি শিল্পরূপ হোল নাটক। সাহিত্য জীবনের শিল্প। নাটকও জীবনকে নিয়ে রচিত—জীবনের দর্পণ। নাটকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। নাটকের প্রাণ হল দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বহীন নাটক শিল্প হিসেবে দুর্বল, ব্যর্থ সৃষ্টি।

ইংরেজি ড্রামা (Drama) শব্দের অর্থ অনুকরণাত্মক অভিনয়—এই অর্থে ড্রামার বাংলা প্রতিশব্দ 'নাটক' বহুল প্রচলিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'নাট্য' শব্দের অর্থ ছিল—নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবায়। পরে এই তিনের সহযোগে অভিনয় অর্থে নাট্য শব্দটির বহুল ব্যবহার ঘটেছে। নাটকে জীবনের প্রতিরূপ প্রতিফলিত হয় বটে কিন্তু তা অনেকটা গতিশীল, চঞ্চল, তরঙ্গাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত। ভাষান্তরে বেগচঞ্চল জীবনের শিল্পীত প্রকাশ হোল নাটক।

গ্রীক আলংকারিক অ্যারিস্টটল ট্রাজেডিকে জীবনের 'অনুকরণ' বললেও, বস্তুতঃ নাট্যক্রিয়ার অনুকরণ—অর্থাৎ জীবনের সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের অনুকরণ। জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্র ধরে নাটকে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার হয়। নাটককে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। নাট্যক্রিয়ায় এই গতিবেগ নাটকের সাফল্যের অন্যতম শর্ত। নাট্যকার কতকগুলি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে নাটকে গতিবেগ সঞ্চার করেন। এজন্য নাটকীয় সংঘাত, নাট্যোৎকণ্ঠা, নাট্যশ্লেষ, প্রচ্ছন্নতা, আকস্মিকতা প্রভৃতি নাটকে অবতারণা করা হয়।

নাটকের লক্ষণগুলিকে পরিশেষে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—সাধারণ লক্ষণ, যা সাহিত্যের অন্য শাখাতেও বিদ্যমান, আর শুধু নাটকে আছে এমন লক্ষণগুলিকে 'বিশেষ লক্ষণ' বলা যেতে পারে। এগুলি হোল ঃ

(১) সাধারণ লক্ষণ ঃ অনুকরণ, দ্বন্দ্ব, নাট্যমায়া, প্রচ্ছন্নতা, সঙ্গীত, শ্রাব্যত্ব, কাব্যত্ব প্রভৃতি।

(২) বিশেষ লক্ষণ ঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা ও শ্লেষ, দৃশ্য-ধর্মিতা, জনসংযোগ প্রভৃতি।

নাটকের গঠনগত দিক থেকে কয়েকটি অঙ্গ আছে। যথা—ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ। নাট্য ঘটনার উদ্ভব-বিকাশ ও পরিণতি বিবর্তন থেকে দেখা যায়। নাট্যকাহিনীর ঘটনাটিতে জটিলতা সৃষ্টি করে, সেই জটিলতামুক্ত নাট্যকারের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। কখনো কখনো ঘটনার সঙ্গে উপকাহিনি যুক্ত হতে দেখা যায়। অনুরূপ চরিত্রেরও একটি ক্রমবিকাশ, পরিশেষে পরিণতি লক্ষ করা যায়। নাটকের বাণী ফুটে ওঠে তার সংলাপে। বাহ্যত নাটকের ধারক-বাহক তার সংলাপ। ঘটনা ও চরিত্র সংলাপের সাহায্যেই বিকশিত ও মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই সংলাপে একধারে যেমন নাটকীয়তা থাকা দরকার, তেমনি তার একটি সাহিত্যগুণও থাকা প্রয়োজন। শেষোক্তটি নাটককে তার মঞ্চের অভিনয়ের গন্ডি থেকে চিরন্তন সাহিত্যের দরবারে হাজির করে দেয়।

নাটকের বিষয়বস্তু রস-পরিণতি ও উপস্থাপনা রীতি অনুযায়ী নাটকের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন—পুরাণ ও ইতিহাস অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক। আবার রসপরিণতি অনুযায়ী—ট্র্যাজেডি, ক্ল্যাসিক্যাল, রোমান্টিক এবং কমেডি, প্রহসন। উপস্থাপনা রীতি অনুসারে বাস্তবধর্মী, রূপক, সাংকেতিক প্রভৃতি।

নাটক পাঠ ও বিচার বিশ্লেষণের সময় পূর্ব আলোচিত প্রসঙ্গগুলি স্মরণে রাখতে হবে।

৮১.৪ সারাংশ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন নাটক জীবনের কথা আলোচনা করে—নাটক জীবনশিল্প। তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। দেশকালের প্রেক্ষাপটে নাটকীয় উপাদান সংগৃহীত হয়। আর অন্যান্য শিল্পকর্মের মত সেই বাস্তবের সেই উপাদানগুলির সাহায্যে নাটকে একটি চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরা হয়।

ইংরেজি নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক রচনার সূচনা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর, তার ব্যাপক বিস্তার, স্বদেশী প্রেরণায় তার ক্রম পরিণতি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাটক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সাহিত্যে-মঞ্চে স্থান করে নেয়। নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের নানা স্তরে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাট্যান্দোলন নতুন বাঁক নেয়। গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়—যা পরে নবনাট্য, সৎ নাট্য আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' ও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' এই বিবর্তন অনুসরণেই রচিত হয়েছে। নাটককে শ্রাব্য-দৃশ্য-কাব্য বলা হয়। এ দিক থেকে নাটক মিশ্র শিল্প। নাটক জীবনাশ্রয়ী, জীবনের শিল্প। জীবনে সুখ-দুঃখের দোলায় নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ।

সাধারণতঃ বিষয় ও রস-বৈচিত্র্য অনুসারে নাটকের শ্রেণি বিভাজন হয়—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, অথবা ট্রাজেডি, কমেডি প্রভৃতি।

নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণে এ বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

৮১.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হলে ১৮-১৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) একক ১ পাঠ করার অন্তত দুটি উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) নাটক জীবনের ———, (খ) নাটক ——— একাধারে ——— আবার ——— বটে। (গ) ——— তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ——— ——— সৃষ্টি করেন। (ঘ) অ্যারিস্টটল ——— জীবনের ——— বললেও, সে বস্তুত ——— অনুকরণ।

৩)নাটক কাকে বলে? নাটকের প্রধান লক্ষণগুলি কী?

৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বাংলা নাটক রচনার সূচনা—
- (১) ১৮২৩
- (২) ১৮৫২
- (৩) ১৮৬০

(খ) 'নীলদর্পণ' নাটক রচয়িতা—
- (১) দীনবন্ধু মিত্র
- (২) রামনারায়ণ তর্করত্ন
- (৩) মধুসূদন দত্ত

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'নবান্ন'
- (১) গণনাট্য
- (২) নবনাট্য
- (৩) সৎনাট্য

৫) 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? নাট্যশাস্ত্রানুসারে নাটকের সংজ্ঞার্থ কী?

৮১.৬ নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ তার দৈনন্দিন আহার সংগ্রহের অভিযানের কথা, তার অভিজ্ঞতা, তার আনন্দ বেদনার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে যে আবেগ, ছন্দ ও অভিব্যক্তির সাহায্য নিয়েছে, তা-ই কালক্রমে জন্ম দিয়েছে নাটকের। নাটক কালক্রমে জনচিত্তরঞ্জনের বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে পরিচিত হোল—গ্রামে ও ভারতবর্ষে। হাজার বছর ধরে তার জয়যাত্রা চলেছে। নাটক এখন আর শুধু বিনোদনের উপায় নয়,

জীবনের সমস্যা-সঙ্কট, আনন্দ-বেদনা, সংযত আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার। নাটক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সে জনজাগরণ ও গণচেতনার উদ্বোধন করে। নাটক বস্তুতঃ জাতির জীবনের প্রতিচ্ছায়া।

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তে (dialogue hyms) কতকগুলি কথোপকথনাত্মক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—এগুলিই সম্ভবত প্রথম নাট্যসাহিত্যের আদিমতম রূপ, ঋক্ ও অথর্ব বেদের সময়ে স্ত্রী-পুরুষরা ভাল পোষাক পরে নাচগান করতেন, উল্লেখ পাওয়া যায়। সামবেদ সংগীত প্রধান—তাই 'সামগান' শব্দটির প্রচলন। আবার বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনেক নাটকীয় আচরণের পরিচয় আছে। বিদগ্ধ ভারততত্ত্ববিদরা মনে করেন গ্রীসের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই ভারতের নাট্য-সাহিত্য ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় গ্রীক নাটকের অভিনয় হোত, তা থেকেই ধীরে ধীরে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে তা সংক্রামিত হয়। গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের চরিত্র চিত্রণে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হোল—তার স্বকীয় মৌলিকত্বের সাহায্যে তাকে নতুন রূপ দিয়ে একান্ত নিজস্ব করে নেওয়া। ভারতের স্বভাবধর্মে কোন কিছুই আর গ্রীক থাকে নি, ভারতীয় করে নিয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সূচনা এই সংশ্লেষধর্মীতার মধ্য দিয়ে। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক', কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষারই ব্যবহার আছে। স্ত্রী চরিত্র বাদে উচ্চশ্রেণির কুশীলবরা সংস্কৃত সংলাপ করেন। স্ত্রী চরিত্রসহ অন্যান্য চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। প্রাকৃত নাটকে এমনটি হয় না। উচ্চ নীচ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রাকৃত সংলাপ বিধেয়। এ জাতীয় নাটককে 'সট্টক' বলে। অনুসন্ধানে জানা যায় 'সট্টকে'র ইতিহাস সুপ্রাচীন। রাজশেখর রচিত 'কর্পূর মঞ্জরী' সট্টকের বিশিষ্ট নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকে কালিদাস স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের অন্যতম নাট্যকার ভাস। ভাস ও কালিদাস উভয়ের নাটকের তুলনায় বিচার করলে দেখা যায়, কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা ভাসের প্রাকৃতে প্রাচীনত্বের ছাপ বেশি। ভাসের সংস্কৃত সর্বত্র ব্যাকরণসম্মত না হলেও, তাঁর গদ্য রচনা কালিদাসের থেকে সুসংহত ও যথার্থ ব্যঞ্জক। কালিদাস অঙ্কিত রাজসভার বর্ণনা অপেক্ষা ভাস-এর রাজসভার বর্ণনা সরল ও অনাড়ম্বর। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের অপর প্রতিভাবান শিল্পী শূদ্রক—তাঁর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের জন্য সবিশেষ খ্যাতি। 'মৃচ্ছকটিক' প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র নির্মাণ করে শূদ্রক অভিনবত্ব শুধু নয়, সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চারু দত্ত ও নগরনটী বসন্তসেনার প্রেমে জীবনের সহজ সত্যটিকে আবিষ্কার করা যায়। রাজকীয় ঐশ্বর্য, কল্পনা এবং ভোগবিলাসই যে প্রেমের লীলাক্ষেত্র নয়, প্রেম বস্তুতঃ জীবনাশ্রয়ী, তার একটি বাস্তব দিক আছে। বহুমুখীনতা ও বৈচিত্র্য মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এই পরম সত্যটি শূদ্রক প্রথম তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যা একান্তই অভাবনীয়। অন্যান্য সংস্কৃত নাটক প্রসঙ্গ বহু আলোচিত, এক্ষেত্রে তা বাহুল্য মাত্র।

৮১.৭ বাংলা নাটকের আদিযুগ ঃ নাট্যগীত, যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা

সংস্কৃত নাটকের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির কোনো সময়েই গভীর যোগ ছিল না। বাংলা নাটকের সূচনা বিলিতী থিয়েটারের অনুকরণ প্রয়াস থেকে। তথাপি বাঙালি জনসাধারণ যে বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পে সেকালে তৃপ্তবোধ করেছে, তার নাম 'যাত্রা'। যাত্রা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বুঝতে যাত্রার আলোচনা এসে পড়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের মত বাংলা নাটকে যাত্রা ও নাট্যগীতের সবিশেষ প্রভাব আছে। উনিশ শতকে যখন বাংলা নাটক সৃষ্টি হচ্ছে, সে সময় যাত্রা খুবই সক্রিয় ছিল। অদ্যাবধি বাংলার গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ তাদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে যাত্রাপালা অভিনয় দেখে। ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের শিল্পিত অভিনয়ের ভাষা ও উপস্থাপনার আবেদন সেখানে সীমিত। প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ পরিচয় একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।

বাঙালি জনমানসে যে যাত্রার প্রভাব আজও ব্যপ্ত, তার উদ্ভবের ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে যে যাত্রাগানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায় তার কোন লিখিত রূপ আজ আর পাওয়া যায় না।

আধুনিক নাট্যশিল্পের অনেক কাছের জিনিস বাংলা লোকনাট্য। গ্রামীণ লোকসমাজে এর উদ্ভব ও সমাদর। লোকনাট্যের মধ্যে রচয়িতার কল্পনা শক্তির পরিবর্তে ঐতিহ্যসম্পন্ন কাহিনিই এর অবলম্বন হোত। স্থানীয় অধিবাসীদের আদিম বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে গীতপালা গড়ে তোলা হোত। পরবর্তী কালের সমাজ, ধর্ম, সামাজিক আদর্শ প্রভৃতি এর সঙ্গে যুক্ত হলেও, আদিম সংস্কারগুলি মূল কাহিনি থেকে হারিয়ে যেত না। লোকনাট্যে অঞ্চল বিশেষের প্রকৃতি ও জীবনের ছবি যেমন ফুটে ওঠে, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্যেরও প্রভাব থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্য থেকেই লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটেছে। এ সব ক্ষেত্রে আদিম সমাজে প্রচলিত নৃত্য ও গীতের প্রভাব অনেকাংশে থেকে যায়। এঁদের বাদ্যযন্ত্রে চামড়ার বাজনা, সঙ্গে বাঁশি, শিঙার ব্যাপক প্রচলন থাকে। লোকনাট্যের সংলাপ সুরেলা ও আবৃত্তিধর্মী, ভাষায় আঞ্চলিকতা অবশ্যম্ভাবী হলেও কবিত্ব বা অলঙ্কার থাকে না। এর বিষয়বস্তু সাধারণতঃ ধর্মমূলক। এখানে মানুষের থেকে দেবদেবীর মহিমাই প্রাধান্য পায়। ধর্ম-অধর্ম, পাপপুণ্য, নীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্বে অশুভশক্তির পরাজয় ঘটে। লোকনাট্য তাই লোকশিক্ষার বাহন।

নাট্যগীতও বহুদিন থেকে লোকশিক্ষায় ও লোকরঞ্জনের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী 'শ্রী গীতগোবিন্দম্' নাট্যগীতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। চর্যাপদে বুদ্ধ নাটকের কথা আছে—'বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই', পদাবলী কীর্তনে পদকর্তা দোহার সঙ্গে নিয়ে গান করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পাত্র-পাত্রীর সংলাপে যখন তাল-লয় যোগে গাইতে দেখা যায়, তা বাস্তবে প্রাচীন যাত্রাপালার গান ছাড়া আর কিছু নয়। এ থেকে আখড়যুক্ত কীর্তনের সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার নিকট সম্বন্ধ অনুমান করা সম্ভব। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত এ ধরনের গান কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হয়েছে। যাত্রার ধর্ম ও সঙ্গীত বাহুল্য থাকলেও, সেখানে নাটকের প্রাণ যে মানবিক দ্বন্দ্ব, তা থাকে না। ধর্ম-

অধর্ম, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ দেবলীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রাচীন যাত্রা বা নাট্যগীতের বিষয়। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য স্থূল ভাঁড় চরিত্র ও আপ্তবাক্য শোনাবার জন্য বিবেক জাতীয় চরিত্র যাত্রায় অপরিহার্য।

এই জাতীয় অভিনয় পরিবেশিত হোত দর্শক পরিবেষ্টিত খোলা আসরে। গায়ক, অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী ও অন্যান্য সহযোগী এবং দর্শক সকলেই আসরে বসে অভিনয় উপভোগ করেন। অপরিমার্জিত, নিরক্ষর দর্শক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে একটু বেশি অঙ্গ-সঞ্চালন, তীব্র কণ্ঠস্বর ও আবেগ প্রকাশ করা প্রয়োজন হোত। সুরেলা আবৃত্তিমূলক সংলাপ উচ্চারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জক হোত।

যাত্রাপালা, লোককাব্য বা নাট্যগীত বাংলার লোকজীবনকে যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় আজও পাওয়া যায়, শিব, চণ্ডী, মনসাকে কেন্দ্র করে নৃত্য গীতাভিনয়ের প্রচলন দেখে। বনবিবি, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি আধুনিক লৌকিক দেবদেবীর পালাগানও অনেক পাওয়া যায়।

যাত্রার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের যাত্রার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ছেড়ে অভিনয় কলা প্রথমে কলকাতা অভিজাত প্রাঙ্গনে, পরে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে আশ্রয় পেয়েছে। বাংলা নাটক রচনার চাহিদা এ সময় থেকে গভীরভাবে অনুভূত হোল। বিদ্যাসুন্দর পালা সাময়িক প্রয়োজন মেটালেও মঞ্চের প্রয়োজন বাস্তব জীবনের সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে নাটকের জয়যাত্রার সূচনা হলেও, যাত্রা হারিয়ে যায় নি। বাঙালির যাত্রার সংস্কার থিয়েটারের অভিনয় বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করেছে। ঠিক তেমনি থিয়েটারও যাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিনয় কলা নিত্যনতুনভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করছে।

৮১.৮ আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ ঃ রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিদ্বৎজনের ইংরেজি নাট্য সাহিত্য, বিশেষতঃ সেক্স্পীয়রের নাটকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। তদুপরি কোলকাতার বিলাতি থিয়েটারে পাশ্চাত্য নাটকের অভিনয় নাটক রচনায় / অনুবাদে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাঙালি যথার্থ অর্থে নাটকের সঙ্গে পূর্বে ঘনিষ্ঠ না হলেও সদৃশ শিল্প—যাত্রা, লোকনাট্য ও নাট্যগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বাঙালি মানসে এর অন্তঃপ্রেরণাটি কাজ করে থাকবে। বস্তুতঃ বাংলা নাটক ইংরেজি নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলার অনুকরণ প্রয়াসী হলেও, সম্পূর্ণত দেশজ লোকায়ত শিল্পকলার প্রভাব অনেকদিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে, একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনার বহু জায়গায় যাত্রাপালা বা নাট্যগীতের প্রভাব দেখা যায়।

আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। পূর্বে কয়েকটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদের পাশাপাশি অন্তত দুটি মৌলিক নাটক রচিত হয়। অনূদিত সংস্কৃত প্রহসন/নাটক হাস্যার্নব (১৮২২) প্রবোধচন্দ্রোদয়, শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' দুটি মৌলিক নাটকের প্রকাশ ১৮৫২। মহাভারতের অর্জুন-সুভদ্রা বিবাহ ঘটনা অবলম্বনে রোমান্টিক কমেডি ধরনের রচনা 'ভদ্রার্জুন', রূপকথার, শীত বসন্ত জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে 'কীর্তিবিলাস' য়ুরোপীয় ধরনের ট্রাজেডী রচনার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। এতৎসত্ত্বেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে নাটক দুটির ঐতিহাসিক মূল্য

স্বীকার করতে হয়। বিচিত্র বিষয় ভাবনা নিয়ে কতকগুলি নাটক রচিত হয়, যেমন—সেক্স্‌পীয়রের অনুসরণে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্ত বিলাস' (১৮৫২), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬) প্রভৃতি। কিন্তু এ পর্বের অন্যতম খ্যাতিমান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। অনেকে এঁকে বাংলার প্রথম নাট্যকার রূপে অভিহিত করেন। কারণ তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), বাংলার কতকগুলি সামাজিক সমস্যা তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা পূর্বে দেখা যায় নি। *নাটকটিতে তিনি কৌলীন্যপ্রথার কুফলগুলি লঘু হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ইংরিজির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। তাই তার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হয়েছে পুরাণমিশ্রিত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব' (১৮৬৭), 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যানুবাদ। অনুবাদগুলি পুরনো আদর্শ ও বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হলেও, মধুসূদনপূর্ব বাঙালী জনসাধারণের রুচিকে নাট্যাভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

নবজাগৃতির মর্মসত্য আপন সত্তার মধ্যে আত্মস্থ করে যুগন্ধর মধুসূদন বাংলা কাব্যে ও নাটকে আধুনিকতার সূচনা করেন। নাট্য সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক। বেলগাছিয়ায় মঞ্চে অভিনয় সূত্রে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' ইংরেজিতে অনুবাদ ও দুর্বল অভিনয় দেখে মধুসূদন নাটকের শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। রচিত হল 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। নাটকটি মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান আশ্রয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাট্যশৈলী অনুসরণে রচিত। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন নাটকের উপজীব্য হোল ঃ Stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. শর্মিষ্ঠার ঘটনাপ্রবাহ এদিক থেকে যথাযথ নাট্যরস সঞ্চারিত করতে পারেনি। তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয়তার দিক থেকে অনেকটা স্বাভাবিক। 'পদ্মাবতী'র কাহিনী গ্রীক পুরাণাশ্রয়ী হলেও গল্পটিকে মধুসূদন সুকৌশলে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত। য়ুরোপীয় নাট্যরীতির আদর্শে রচিত। এই নাটকের পটভূমিতে রাজ্যের ভাঙা-গড়া, ব্যক্তি চরিত্রের পাঠ্য, চাতুর্য, অর্থলোভ, কামনা-বাসনা, অর্ধস্ফুট স্নিগ্ধপ্রেম প্রভৃতি বিচিত্র প্রকৃতির আলোড়ন ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণার আত্মহত্যা ট্রাজেডির মর্মগূঢ় তীব্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। মধুসূদন এই নাটকে গ্রীক অদৃষ্টবাদকে জয়ী করেছেন।

মধুসূদন দু'খানি প্রহসন লিখেছিলেন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এ দুটি অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। প্রহসন দুটি সংস্কৃত প্রহসন ও প্রকরণের অনুসারী নয়। এতে মধুসূদনের সমাজ বাস্তবতা বোধের পরিচয় আছে। প্রথমোক্তটিতে

---

* পাদটীকা—বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিত হওয়া সংক্রান্ত পুস্তিকা তখনও প্রকাশিত হয়নি। পুস্তিকাদুটি ১৮৭১ ও ১৮৭৩ এ প্রকাশের পর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

নব্যপন্থীদের উল্লাস-উদ্বেলতার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শেষোক্ত প্রাচীনপন্থীদের অতি বর্বরতা বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার প্রহসনের চরিত্রগুলি অল্প পরিসরে অত্যন্ত জীবন্ত করে এঁকেছেন। এঁদের মুখের সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করায় চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

নবযুগের শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ মধুসূদন তাঁর বৈদগ্ধ্যে, মননে সংস্কৃত ও ইংরিজি নাট্যধারার পার্থক্য উপলব্ধি করে ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন।

তিনি স্বকীয় প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নাটক পূর্বসুরীদের তুলনায় বিস্ময়কর সমুন্নতির অধিকারী। তিনি প্রহসনে নব্য সমাজ ও গণজীবনের যে রূপ চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সহ কয়েকটি লঘু নাট্য রচনার প্রেরণা মনে করা যেতে পারে।

সমাজ বাস্তবতা স·পর্কে সম্যক জ্ঞান, মানুষের সম্বন্ধে একান্ত মমত্ববোধ, জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন রসদৃষ্টি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের যে বৈশিষ্ট্য, তার অনেকগুলিই দীনবন্ধু মিত্রের ছিল। এ দেশের নাট্য ঐতিহ্যের ব্যাপকতা না থাকায়, ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজি নাট্যশৈলীর সম্যক অনুশীলনের অভাবে শিল্পগতভাবে সর্বত্র সফল নন। দীনবন্ধুর শিল্পবোধের কেন্দ্রে ছিল বস্তুনিষ্ঠা। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের ভাষ্যকার।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নীলকর কর্তৃক নীলচাষীদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার মর্মান্তিক কাহিনী। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহরের সাধারণ প্রজা ও সম্পন্ন গৃহস্থ নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, সংঘবদ্ধ হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রেক্ষাপটে দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেছেন। নাটকটিতে তৎকালীন পল্লীজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচার পীড়নের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। জনজীবনের আশ্চর্য বাস্তব জীবনালেখ্য নাটকটিতে এমন সত্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, অভিনয়ের দিক থেকে নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু 'সাহিত্য' হিসেবে নীলদর্পণ যথার্থ সফল ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কারুণ্য সঞ্চারের জন্য একাধিক মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা নাটকীয় রসসৃষ্টিতে অন্তরায় হয়েছে। ভদ্র চরিত্রগুলি কৃত্রিম ও ব্যর্থ সৃষ্টি। কিন্তু ভদ্রেতর চরিত্র ও তাদের সংলাপ, আচরণ বাস্তবসম্মত ও অনেকাংশে সার্থক।

'নীলদর্পণের' পরে রচিত দুটি নাটক—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) ও 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান, প্রাণহীন ও দুর্বল রচনা। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) দুখানি প্রহসন বৃদ্ধের বিবাহ ও 'ঘরজামাই' থাকার বিড়ম্বনার চিত্র হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসনটি দীনবন্ধুর কালজয়ী রচনা। এর কাহিনী ঘননিবদ্ধ নয়। এই প্রহসনের বক্তব্য বিষয়কে ছাপিয়ে উঠেছে অসামান্য কতগুলি চরিত্র চিত্রণ। নিমচাঁদ, অটল, কেনারাম, ডেপুটি প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই নাট্যকারের অনন্য সৃষ্টি, স্বীকার করতে হয়। প্রহসনের সংলাপ রচনায়, ভাষা শৈলীতে দীনবন্ধু অনেক সাফল্য অর্জন করেছেন। অপর দিকে 'নীলদর্পণ' বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম নাটক, যার প্রচার দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।